শব্দ সংখ্যা ৬৩৭৩

নগর ঢাকা জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাট্যচর্চায় নারী

ইসরাফিল শাহীন ও সুদীপ চক্রবর্তী

ভূমিকা

আবহমান বাংলার গৃহাঙ্গন-মাঠ-ঘাট-গ্রাম-গঞ্জ-হাট-জনপদে বিকশিত ও চর্চিত গান-নাচ-বাদ্য-অভিনয়যোগে উপস্থাপিত গল্পমূলক বা গল্পহীন পরিবেশনায় নারী কুশীলবের অংশগ্রহণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থাকলেও মধ্যযুগ এবং আধুনিকযুগের সন্ধিকাল (১৭ শতক) থেকে ব্রিটিশ অনুপ্রাণনে নব্যবিকশিত 'শহুরে' সংস্কৃতিতে নারী কুশীলবের অংশগ্রহণ বিপরীত অক্ষে অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় ঘটনাপ্রবাহ অধিকতর তথ্যবহুল। "এটা কি সেকালে প্রচলিত জাপানি সাধারণ মানুষের নৈতিকতার সম্প্রসারণ—যেখানে ১৬১৯ সালেও কাবুকি নাট্যে নারীর অংশগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ? যদিও উল্লেখিত সময়ের কয়েক দশক পূর্বে এই নাট্যের উৎপত্তি হয়েছিল কিওতো নগরীর ওকুনি নামক এক নটিনীর সর্বসাধারণ সমক্ষে অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নৃত্যাভিনয় হতে। এমনকি আঠারো শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী চীনা নাট্যশিল্পেও নারী অভিনয়শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। পুরুষদের দ্বারা নারী-চরিত্র রূপায়ণ কি এই কারণে হতো, ইউজিনিও বারবা যাকে বলেছেন চরিত্র রূপায়ণে শিল্পীদের জেন্ডার পার্থক্য আসলেই গৌণ?"[১] বারবা সুনির্দিষ্ট করে বলেন যে, 'পৌরুষ' ও 'নারীত্ব' যথাক্রমে পুরুষ ও নারী দ্বারাই সর্বোত্তমভাবে রূপায়িত হবে এমনটা অত্যাবশ্যক নয়। অভিব্যক্তি-পূর্ব পর্যায়ে (অর্থাৎ শৈল্পিক অভিব্যক্তির পূর্ব পর্যায়ে) কুশীলবের লিঙ্গ পরিচয় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা কথিত 'পৌরুষ' ও 'নারীত্ব'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই।[২] বারবা'র ধারণা অনুসারে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই 'লাস্য' শক্তি এবং 'তাণ্ডব' শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। আর এ দুটির (প্রয়োগের) মাধ্যমেই একজন শিল্পী দৃশ্যজ শরীরের মধ্য দিয়ে তার 'উপস্থিতি'কে নির্মাণ করে যা আমরা পৌরুষ এবং নারীত্ব হিসেবে চাক্ষুষ করি। অন্যদিকে এরিক মুন্‌ক মার্কসবাদী এক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন। মুন্‌ক বিশ্বাস করেন, "যখন পুরুষেরা ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ থাকে তখন তারা নারীত্বের খুবই সাদামাটা একটা ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে, চতুর কৌশলে 'নারীবাচক' শক্তি হিসেবে নারীর চরিত্র রূপায়ণ করে, কিন্তু এক্ষেত্রে নারীদেরই তা প্রয়োগ করতে বাধা দেয়া হয় বা দূরে সরিয়ে রাখা হয়।"[৩] ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্যকলার নাগরিক ধারা ছিল 'পুরুষ দ্বারা, পুরুষের জন্য এবং পুরুষ নিয়ন্ত্রিত' চর্চা। নাটকে নারীর অংশগ্রহণ ছিল পুরুষশাসিত সমাজের চোখে 'অশোভন'। কিন্তু নাটকাভিনয়ে নারী চরিত্র উপস্থাপিত হতো ঠিকই, তবে তা পুরুষ অভিনেতার রূপায়ণে। পুরুষশাসিত সমাজের প্রত্যাশা, চারদেয়ালের বাইরে নারী থাকবে অবগুণ্ঠিত এবং ভদ্র, নিরীহ, স্নেহশীল ঘরে-বাইরে যুগপৎ। তবে কেমন করে নারী মঞ্চে দাঁড়ায়

একটি চরিত্র নিয়ে, সে হোক তার সমলিঙ্গীয় চরিত্র অর্থাৎ মা, মেয়ে, স্ত্রী, বোন কিংবা প্রেমিকা। শত সহস্র পুরুষ চোখের সামনে এই চারদেয়ালে অবগুণ্ঠিত নারী পারে না তার 'শরীর' নিয়ে দাঁড়াতে 'অপর পুরুষ'-এর সামনে বা পাশে। আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ-বিলাস সবই যে সংরক্ষিত সেই 'কর্তা পুরুষ'-এর জন্য! নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সীমানা, আবার তার উপর নির্মিত হয়েছে বাধার প্রাচীর। অথচ বাংলা নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলবের অংশগ্রহণের ইতিহাস অনুসন্ধানে এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য স্পষ্ট হয়। নৃত্য-গীত-বাদ্যযোগে বর্ণনাত্মক অভিনয়, চরিত্র ভূমিকায় অভিনয়, উত্তম পুরুষে সংলাপ, দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি এবং রসবিস্তারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের একজন কুশীলব, নট বা নটী যাই হোন, কেবল অভিনেতা/নেত্রীই নন, একই সাথে একজন নাচিয়ে বা/এবং গাইয়ের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পরিবেশনাকে উজ্জ্বল করে রাখেন। এই পটভূমিতেই সৈয়দ জামিল আহমেদ তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে বাংলা নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলবের নিদর্শন অনুসন্ধান করেন।

১৪২৫-৩২ এর মধ্যে মা হুয়ান কৃত Ying Tai Sheng-Lan গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে রাজকীয় ভোজসভায় পেশাদার নারী নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পীগণ জমকালো পোশাক সজ্জিত হয়ে পুরুষ যন্ত্রীদের সাথে অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। মধ্যযুগের পরিবেশনামূলক সাহিত্যে নারী কুশীলবের এসকল উল্লেখ যখন সুস্পষ্টভাবে তাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, ঠিক তখন বিস্ময়করভাবে চৈতন্যের কৃষ্ণ যাত্রা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীত হতে দেখা যায়। কারণ চৈতন্যের নিকট মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক ছিল রাধা-কৃষ্ণের সমতুল্য। উপরন্তু তৎকালীন সমাজে নারী কুশীলবকে পতিতার সমতুল্য করে দেখা হতো। অনেক গবেষক মনে করেন, আবহমান বাংলার নাট্য পরিবেশনার প্রতিটি শাখায় পুরুষ কুশীলব দ্বারা নারী চরিত্র রূপায়ণ প্রবণতা সম্প্রসারিত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক ভিত রচিত হয়েছে প্রধানত চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের অভিনয়কালে নারী ভূমিকায় রূপদানকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথমদিকে (তেরো থেকে ষোলো শতক) একটি স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটায় এই প্রেক্ষাপট থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হয়। সৈয়দ জামিল আহমেদ এর পেছনে তিনটি কারণ নির্ণয় করেছেন। এগুলো: ১. মুসলিম শাসন, ২. বৈষ্ণব নাট্য-গীত চর্চা ও ৩. সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব বিছিন্ন নান্দনিক চাহিদা যা শক্তির 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' ধারণা স্বীকার করে। মুসলিম শাসনামলে দরবারে বিনোদন হিসেবে নৃত্য গুরুত্ব পেলেও অমুসলিম আখ্যানসমূহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে পরিত্যক্ত বা রূপান্তরিত হয়। ফলে ষোলো শতকের ভেতরে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরভিত্তিক নাট্যাভিনয় হতে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পূরক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ দেশজ (লোক ও সংস্কৃত) নাট্যধারাকে কোনঠাসা করে ইউরোপীয় আদর্শ অনুসৃত পিকচার ফ্রেম প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে বাংলার মূল স্রোতধারায় পরিণত করে এবং

'জনগণের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়' রোধের সংকল্পে ১৭৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতার ইংরেজি নাট্যশালায় অভিনেত্রীর পদার্পণ নিষিদ্ধ করে রাখে—যদিও খোদ বিলেতে সতেরো শতকের পঞ্চাশের দশকেই মঞ্চে অভিনেত্রীর আগমন ঘটেছিল। গেরাসিম লেবেদেফ ১৭৯৫ সালে জডরেল কৃত 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি মঞ্চায়নে নারী-পুরুষ কুশীলব সমন্বয়ে সমর্থ হন। এর পরবর্তী প্রয়াস নবীনচন্দ্র বসু'র 'বিদ্যাসুন্দর' প্রযোজনায় লক্ষ্য করা যায়। আর ঢাকায় দেখা যায় ১৮৮০ সালে (মতান্তরে ১৮৯৩/৯৪)। তেরো শতকে মুসলিম ও ষোলো শতকে বৈষ্ণব—পরপর এই দুই পিতৃতান্ত্রিক আঘাতের পর বাংলা অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিকতার ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ষোলো শতকের শেষ নাগাদ বাংলায় একটি প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়: পিতৃতান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট অগ্রগতি। পরিণতিতে পুরুষ আধিপত্য ক্রমশ প্রবল হয় এবং নারী প্রেরিত হয় অন্তঃপুরে।[৪] তবে এই বিভেদ রেখা এবং পেশীশাসনমূলক বিরোধিতা ঘুচতে শুরু করে অচিরে। যদিও বিভাজন বিরোধী স্রোত ছিল খুবই ধীর। তবু তার অংকিত রেখা ক্রমশ গভীর ও বিস্তৃত হয় নাগরিক মঞ্চে একজন, দুজন করে বাড়তে থাকা নারীর সাহসী পদচারণায়।

অবিভক্ত ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনাপর্ব থেকেই ইংরেজরা তাদের ব্যবসায়িক বিকাশ, বিনোদন ও নিজস্ব সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার একটি হলো, কক্ষ অভ্যন্তরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে নাটক পরিবেশন করা। দর্শক আসন একপাশে এবং অভিনয় স্থান অন্যপাশে। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এই স্থানগত আন্তঃদূরত্বের ধারণা ইউরোপে বিকশিত হয় বহু আগে। ক্রমাগত উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে নাট্য মঞ্চায়নের এই রীতি ইংরেজরা ছড়িয়ে দেয় পুরো বিশ্ব জুড়ে। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেদেফ যখন এই রীতিতে পরপর দুটো নাটক ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে কলকাতায় মঞ্চস্থ করলেন, তখন তাতে প্রাণিত হয়ে প্রথমে কলকাতার নগরায়তনের বাঙালি বাবুদের মাঝে এবং পরে সাধারণ্যে সে রীতির চর্চা শুরু হয়। "কলকাতাকেন্দ্রিক এসব নাট্যচর্চা আঠারো ও উনিশ শতকের রঙ্গরসপ্রিয় বাবু-সংস্কৃতির স্থূল রসচর্চার মাঝে বাঙালি ভাবমানসে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জীবনচেতনা সঞ্চারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয় ও অপেরার অনুকরণে ও অনুসরণে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যশালা।"[৫]

উনিশ শতকে কলকাতায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাংলা থিয়েটারের জন্ম, লালন এবং তার বিকাশ ঘটলেও ১৮৫০-এর মধ্যভাগ থেকে থিয়েটার আর কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। ঢাকাসহ এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে।[৬] ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসস্থল অনুসারে কলকাতার মতো পূর্ব বাংলার অনেক স্থানেও রঙ্গালয় গড়ে ওঠে এবং সেখানে ইংরেজি ভাষায় বিদেশি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে যা ছিল স্থানীয় জনজীবন-বিচ্ছিন্ন। ইংরেজদের এই

নাট্যমঞ্চায়ন ধারার পাশাপাশি স্থানীয় শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী বা গ্রুপ থিয়েটার-মেজাজী নাট্যগোষ্ঠীগুলোর নাট্যমঞ্চায়ন ছিল উল্লেখযোগ্য যা জনজীবনসম্পৃক্ত।[৭]

ঢাকা নগরীতে ১৮৭২ সালের ৩০শে মার্চ 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'[৮] নামক মঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' প্রযোজিত ও মনমোহন বসু রচিত 'রামাভিষেক' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) উপর্যুক্ত ধারার নাট্যচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। "মন্ডি সাহেবের কুঠি ও পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ [বিশ্ববিদ্যালয়] অবস্থিত সেই স্থানে উহা ছিল [পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি]। মোহনীমোহন দাস (সব্জী মহল), অভয় দাস, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল চক্রবর্তী (নর্ম্মাল স্কুল পণ্ডিত), মহেশ গাঙ্গুলী, রাম চক্রবর্তী (প্লিডার, মুন্সেফ কোর্ট) প্রমুখ ব্যক্তিগণ পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজের উদ্যোক্তা ছিলেন।"[৯] ঐতিহাসিকদের মতে, 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'ই পূর্ব বাংলার প্রথম নাট্যশালা।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ঢাকার নাট্যচর্চায় নারীর ভূমিকা

ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্যকলার নাগরিক ধারা ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের ছোট শহরগুলোতে শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ কলকাতার কিছু পরে।[১০] এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঢাকা থিয়েটারের অনন্য ব্যক্তিত্ব জমিদার ব্রজগোপাল দাসের উক্তি স্মরণীয় :

> পাশ্চাত্যের নকল থিয়েটারের পীঠভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পীঠভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কিছুই ছিল না। না জেনে না বুঝে নকল। পরিকল্পনা, মঞ্চ স্থাপত্য—এ সবের কোন ধার ধারা হত না। নকলের নকল যা হয় তাই।
>
> ... ছিল সখীর পার্ট, গানের প্রাচুর্য। ছিল না সমাজ দায়িত্ববোধ, পারিবারিক জীবনই ছিল নাটকের প্রধান উপজীব্য। ... এন্টারটেইনমেন্ট ভ্যালু—এটাই ছিল মূল কথা। ভাল প্রডাকশন হলে দর্শকরা তার মধ্যেই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলত।[১১]

ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম মঞ্চায়িত নাটক হলো দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' (১৮৬১)। আঠারো শতকের সত্তর দশকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং অন্যান্য আরো কিছু নাটক নিয়ে সৌখিন নাট্যদলগুলো মঞ্চে আবির্ভূত হলে তাঁরা ঢাকাবাসীর কাছ থেকে লাভ করে বিপুল সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা।

ঢাকাভিত্তিক সৌখিন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' বা 'ইস্টবেঙ্গল ড্রামাটিক হল' পালন করেছিল ব্যাপক উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা।

এছাড়া উর্দু ভাষায় নাট্যচর্চা ঢাকায় তখন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'ফেরহাত আবজা' (মতান্তরে, 'ফরহাত আফরোজ')[১২] ১৮৯০ সালের মধ্যে নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনের যোগ্যতাসম্পন্ন দল হিসেবে আলী নফিসের দল ৩০টি উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করে। এই নাটকগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, স্থানীয় সুন্দরী গণিকাগণ এসব নাটকে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তেমন প্রয়োজন হলে তারা পুরুষ ভূমিকায়ও অভিনয় করতেন।

১৮৯০ সালে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভবনটি ভেঙে ফেলা হয় এবং সেস্থলে গড়ে ওঠে 'ক্রাউন থিয়েটার'। এর পূর্বে 'সনাতন নাট্য সমাজ'-এর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ প্রাকৃতিক ঝড়ে ভেঙে গেলে সংস্থাটি চিরতরে লুপ্ত হয় এবং সংস্থার উদ্যোক্তারা সম্মিলিতভাবে ১৮৯০ সালের গোড়ার দিকে গড়ে তোলেন 'ক্রাউন থিয়েটার'।[১৩] 'ক্রাউন থিয়েটার'-এর বড়ো কৃতিত্ব, ঢাকার মঞ্চে অভিনেত্রীরূপে স্থানীয় নারী (এবং মহিলাদের) অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো নাটক মঞ্চায়ন। ১৮৯৩ সালে (মতান্তরে ১৮৯৪ সাল)[১৪] গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে এই বিরল ঘটনার সূত্রপাত। এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দুনিয়া, নায়ক হয়েছিলেন ললিতচন্দ্র দাস।[১৫] দুনিয়া অবশ্যই বারবণিতা ছিলেন। কারণ, তখন নারী অভিনেত্রী পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো উপায় ছিল না। আর তাছাড়া ঢাকার বাইজিরা ঐতিহ্যগতভাবেই নৃত্যগীতে ছিলেন পটু। তবে মঞ্চে অভিনেত্রীর আগমণ নিয়ে ঢাকায় তখন বেশ হৈচৈ শুরু হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিলো,

> মনোহরিণী বারবণিতাগণ অভিনয় করে বলিয়া যাহারা আপত্তি করেন, তাহারা এই নাট্যাভিনয়ের সুখ সৌন্দর্যে বঞ্চিত হতে পারেন; কিন্তু সর্ব্ব সাধারণে যখন তাহাদের ভদ্রমহিলাগণের নৃত্যগীতাদি দর্শনে শ্রবণে সমর্থ নহে... অপিচ এই অভাববশত লোককে যখন বাইখেমটাওয়ালার নৃত্যগীতে যোগ দিতেই হয় তখন তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এই নাটক অভিনয় দর্শনে আমরা কাহারও পক্ষে অন্যায় মনে করি না।[১৬]

জানা যায়, এই মন্তব্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের থিয়েটার-প্রীতি সঞ্জাত নয়, এই কটাক্ষ ছিলো ব্রাহ্মসমাজের প্রতি, যারা ছিলো মঞ্চে বারবণিতা আমদানীর বিরুদ্ধে। সত্যেন সেন তাঁর 'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থে ক্রাউন থিয়েটারের তৎকালীন জনপ্রিয় কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন হরিপদ দে, বিনু বাবু, বিনোদ বাবু, নুটু রায়, রাধা মাধব চক্রবর্তী, গৌরচন্দ্র দাস, বর্ধমানের রাণী (ছদ্ম নাম), কনক সরোজনী ও সরলা। কনক সরোজনী ছিলেন রাখাল দাসের রক্ষিতা (ক্রাউন থিয়েটারের একজন অংশীদার ছিলেন রাখাল বসাক) এবং রাণী ছিলেন বর্ধমান অঞ্চলের মেয়ে। ক্রাউন থিয়েটার প্রয়োজনবোধে কলকাতা থেকেও অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানি করতো।[১৭] ১৮৯৭ সালে বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী 'ক্রাউন থিয়েটার' থেকে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে,

ক্রাউন-এর প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন 'ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার'।[১৮]

শিশির কুমার বসাক-এর উদ্ধৃতি অনুসারে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, গুন্নু বাঈ, আন্নু বাঈ এবং নয়াবন (মতান্তরে নওয়াবীন)—এই তিন বোন 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া করে টিকেট বিক্রি করে 'ইন্দ্রসভা' মঞ্চস্থ করেছিলেন।[১৯] শিশির কুমার বসাক মঞ্চায়নের কোনো তারিখ উল্লেখ করেন নি। তবে মুনতাসীর মামুন 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদ অনুযায়ী ঘটনাটি ১৮৮০ সালের বলে জানান। তিনি তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে ধারণা করেন, ঢাকায় স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম এবং থিয়েটারের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র মহিলাদের উদ্যোগে নাটকাভিনয়ও এই প্রথম। যদিও মুনতাসীর মামুন তাঁর 'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের থিয়েটার ও নাটক' গ্রন্থে সৈয়দ মুর্তাজা আলী'র প্রবন্ধ অনুযায়ী ক্রাউন থিয়েটারে ১৮৯৩/৯৪ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে অভিনেত্রী 'দুনিয়া'র মঞ্চাভিনয়কে স্থানীয় মহিলা অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো নাটক মঞ্চায়ন বলে পূর্বে একবার উল্লেখ করেছেন। চলমান আলোচনায়ও বিষয়টি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গুন্নু বাঈ, আন্নু বাঈ এবং নয়াবন এই তিনবোন নওয়াব আব্দুল গনির দরবারে নিয়মিত নাচতেন, গাইতেন এবং মাসোয়ারা পেতেন।

পেশাদারী নাট্য সংস্থাগুলোই মূলত মঞ্চাভিনয়ে অভিনেত্রী নিয়ে আসে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত, অন্তত যতোদিন না সিনেমা বা চলচ্চিত্র প্রবর্তনের কারণে পেশাদার নাট্যচর্চার জনপ্রিয়তা কমে।

পূর্ববঙ্গে থিয়েটার চর্চা বিকশিত হলে, সত্তর দশক থেকে কলকাতা, দিল্লী ও মুম্বাই-এর পেশাদারী নাট্যদলগুলো ঢাকাসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসে নাটক মঞ্চায়ন করতে থাকে। আগত দলগুলোর মধ্যে কলকাতার নাট্যদলগুলোই ছিল প্রধান এবং তাদের নাট্যপ্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা। তারা পূর্ববাংলার বিভিন্ন নাট্যদল, ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং ঢাকার নবাব-এর আমন্ত্রণে এখানে আসতেন। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকায় আসা মাত্রই হৈচৈ শুরু হয়। কারণ, নাট্যদলভুক্ত অভিনেত্রীরা ছিলেন বারাঙ্গনা। এ নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিলো—

> ঢাকা ছাত্রসভা অভিনয় দর্শনের যেরূপ বিরুদ্ধবাদী— সব সাধারণকে তদ্দর্শন বিরত রাখিতে যেরূপ অভিলাষী আমরা ততদূর নহি। যখন সাধারণভাবে ঘাটে পথে চলিতে ফিরিতে বারবিলাসিনীদিগের রূপ দর্শন ও বাক্যশ্রবণ নিরোধ করিবার উপায় নাই- দেশীয় লোকের রুচি অনুসারে আমোদজনক ব্যাপারমাত্রই প্রায় বাইখেমটার নৃত্যগীত হইয়া থাকে, তখন বারাঙ্গনা দেখিব না বা তাহাদিগের কথাবার্তা কি গীতিকবিতা শ্রবণ করিব না বর্তমান সমাজস্থ কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।[২০]

ন্যাশনাল থিয়েটার-এর মতো স্টার থিয়েটারও ১৮৮৭ সালে ঢাকায় এসে রক্ষণশীল সমাজের বাধার মুখে পড়ে। বিশেষ করে এ বিষয়ে ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলো ব্রাহ্ম সমাজ। মঞ্চে অভিনেত্রীর অভিনয় নিয়েই তাদের অভিযোগ। ব্রাহ্মদের মতে, দুই তিন ঘণ্টা সমানে মেয়ে সংযুক্ত অভিনয় দেখলে মানুষের মন উত্তেজিত হয়, সুতরাং সেরূপ অভিনয় একেবারে না দেখাই উচিৎ।[২১]

বিশ শতকের শুরুতে মীর্জা আব্দুল কাদেরের উদ্যোগে 'ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার'-এর নতুন নামকরণ হয় 'লায়ন থিয়েটার'। এখানে বাঙালি হিন্দু অভিনেত্রী-সমৃদ্ধ উর্দু নাটকের পাশাপাশি স্থানীয় বাঙালি নাট্যকার রচিত প্রহসনও প্রদর্শিত হত। উনিশ শতকীয় পূর্ববঙ্গের (বিশেষত ঢাকার) নাট্যচর্চা বিশ শতকের গোড়ায় এসে তার গুণগত পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে। পেশাদার নাট্যদলগুলো সমস্ত রাত ধরে হালকা বিনোদনমূলক নাটক পরিবেশনের সাথে জুড়ে দিতো বেশ ভালো মাত্রার নাচ ও গান।[২২] লায়ন থিয়েটার তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। ঢাকা শহরের ছাত্রদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। এ সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক আবুল ফজল স্মৃতিচারণ করে বলেন,

> ঢাকায় আমাদের মেস আর লায়ন থিয়েটারের মাঝখানে এক মসজিদ। রোজ সে মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে নবাবজাদাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই সুপারিন্টেনডেন্ট মেসের উঁচুগেটটায় নিজের হাতেই একটা বড় তালা লাগিয়ে দিতেন আর চাবিটা নিজের লম্বা কোর্তার পকেটে ফেলে নিজের আস্তানায় গিয়ে ঢুকতেন। আমরা ওৎ পেতে থাকতাম। তিনি নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেই শুরু হতো আমাদের গেট টপকানো। লায়ন থিয়েটার শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকতো না, ডাকতো নর্তকীদের সুললিত কণ্ঠও। ... নর্তকীদের পায়ের নূপুর গুঞ্জন পর্যন্ত আমরা শুনতে পেতাম লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে। ... গেটটাও ছিল ভয়ানক উঁচু—রাত্রের অন্ধকারে টপকাতে হতো বলে মাঝে মাঝে পড়ে গিয়ে কারো কারো হাত পাও যে ছড়ে না যেতো তা নয়। যে রাতে, 'লাইলি-মজনু' কি 'শিরি-ফরহাদ' হতো, সে রাতে হলে তিল ধারণের স্থান থাকতো না ...।
>
> বেশীর ভাগই হতো উর্দু নাটক। অথচ অভিনেত্রীরা সবাই ছিল বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে। ... উর্দু নাটকে এরা যে শুধু চমৎকার অভিনয় করতো তা নয়, উর্দু গান ও গজলও গাইতো অত্যন্ত চমৎকারভাবে। ... সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিদ্যুৎময়ীর কথা আজো মনে আছে। ... সারা ঢাকা শহর তখন ওর নামে পাগল আর সকলের মুখে মুখে ফিরতো ওর নাম।[২৩]

১৯২৫-২৬ সালের দিকে নাটক প্রযোজনায় ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এবং সিনেমার আগমনে ঢাকা শহরে পেশাদার নাট্যচর্চা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হলেও স্তিমিত হয়ে আসে।

এ সময় বলদার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বেকার হয়ে পড়া নট-নটী ও কলা-কুশলীদের বেতনভূক্ত কুশীলব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে নিজ বাসভবনে প্রতি শনি ও রবিবার তাঁরই রচিত ও নির্দেশিত নাটক মঞ্চস্থ করেন।

বিশ শতকের শুরু থেকেই ঢাকায় বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লার নামে নাট্যদল বা ক্লাব গঠিত হতে থাকে। যেমন - 'লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ীর সখের দল', 'সব্জি মহল ড্রামাটিক ক্লাব' এবং 'পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাব'।[২৪] এই নাট্যদলগুলোর মধ্যে শুধু পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাবই মঞ্চে স্থানীয় মেয়েদের অভিনয়ে নাটক মঞ্চায়নে অগ্রসর হয়। যদিও সে চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাব-এর মধ্যমণি অভিনেতা নকুলেশ্বর দাশ 'ঢাকেশ্বরী থিয়েটার' নামে একটি দল গঠন করে স্থানীয় পাঁচ-ছয়জন নারী কুশীলব নিয়ে দর্শনীর বিনিময়ে পরপর তিনদিন নাটক মঞ্চায়ন করেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম সরোজিনী। বলা বাহুল্য, এরা কেউ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নন। কিন্তু দর্শকমহলে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় এই দলের প্রয়াস বেশিদূর এগোতে পারেনি। শখের দলে তখনও মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরাই অভিনয় করতো। ভদ্রঘরের মেয়েরা তখনও প্রকাশ্যে মঞ্চে এসে দাঁড়ায়নি। আর পতিতা মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার করতে শখের দলগুলোর হয় রুচিতে বাধত। এই সময় শখের নাট্যদলগুলোকে নাচ-গানের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হতো, নয়তো অভিনয় জমতো না।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল মূলত এই তিনটি ছাত্রবাস বা 'হল' নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা ঢাকার নাট্যচর্চার গুণগত পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

থিয়েটারে প্রতিশ্রুতি ও ঐকান্তিকতার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। বিশ শতকের একজন সাধারণ নারী হয়েও নাটকের প্রতি আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন অভিনেত্রী 'কমলার মা'। ১৯৩২ সালে মির্জা আব্দুল কাদের সর্দারের লায়ন সিনেমা হলে অভিনেত্রী 'কমলার মা'র উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে উর্দু নাটক 'আঞ্জুমান আরা' মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের শুরুতেই একটা সংকট দেখা দেয়। সে রাতের জন্য ১৩০ টাকার বিনিময়ে হল ভাড়া নেয়া হলেও টিকেট বিক্রি হয় মাত্র ৩২ টাকার। এসময় সিনেমা হলের মালিক মির্জা আব্দুল কাদের সর্দার উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শুরু হবার পূর্বে ভাড়ার টাকা পরিশোধ না করলে নাটক মঞ্চায়ন করা যাবে না বলে তিনি ঘোষণা দেন। এ নিয়ে অনেক অনুরোধ-উপরোধেও তিনি ভাড়ার টাকা পরে নিতে রাজী হলেন না। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রস্তুত, অধৈর্য দর্শকের চ্যাঁচামেচি সবমিলে এক সংকটময় মুহূর্ত। কমলার মা তখন আর কোন উপায় না দেখে নিজের গলার সোনার হার মির্জা আব্দুল কাদের সর্দারের হাতে বাঁধা দিয়ে অভিনয় শুরু করলেন।[২৫]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ পর্যন্ত ঢাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটক লিখিত, প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রকাশিত প্রহসন ও ব্যঙ্গ নাটক-নাটিকাগুলোতে সমকালীন সমাজ-জীবন-যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা-মুক্তির ইঙ্গিত বর্তমান। নারীজাগরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'তাজ্জব ব্যাপার' নামক প্রহসনে:

ফাটকে আটক রব না,
দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন মাঠের বাইরে দিয়াছি
দখল কর জেনানা।
আমরা সব কলেজে যাব 'নলেজ' পাব,
টপ্পা গেয়ে করব সুখে বাবুয়ানা,
এখন তোমরা কূটনা কোটো
বাটনা বাটো
দাও লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনা।
অথবা— আমাদের করে স্বাধীন,
মিন্‌ষেরা হ'ল অধীন
ব্যাচারারা ভাই রাধে
উননে ফু পাড়ে আর কাঁদে।[২৬]

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাটক রচনা, প্রকাশনা ও মঞ্চায়নের পাশাপাশি দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে। স্থানীয় মহিলা অভিনেত্রীর সহ-অভিনয়ও লক্ষ্যণীয়। তথাপি ঢাকার নাট্যচর্চায় গতি সৃষ্টি হয় নি-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে নি।[২৭]

উপনিবেশ-উত্তর কালে পাকিস্তান শাসনাধীন ঢাকার নাট্যচর্চায় নারীর ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। এই দেশ বিভাগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করলেও এর ফলে এক বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, যাকে উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক ট্র্যাজেডি বলে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য অন্যদিকে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র এতকাল শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার এক বিরাট সুযোগও এনে দেয়। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ও ভূ-স্বামীদের অর্থপুষ্ট বাঙালি হিন্দু মধ্যশ্রেণি পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। দেশ বিভাগের পর বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ক্রমবর্ধমান হারে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করা শুরু করলে স্থানীয় মুসলমান নাট্যকারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সুস্পষ্ট সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। নবোদ্ভূত

পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতি ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে দুটি বিরোধী শিবিরে ভাগ হতে থাকে, যার একদিকে অবস্থান নেয় রক্ষণশীল ইসলামি মৌলবাদ এবং অন্যদিকে একত্রিত হতে থাকে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী শক্তি।

সুকুমার বিশ্বাস তাঁর গবেষণায় ১৯৪৭-১৯৫১ সাল পর্যন্ত সমগ্র পূর্ববাংলার নাট্যচর্চাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শহর ও শহরতলীকেন্দ্রিক প্রাগসর চেতনাসমৃদ্ধ নাট্যচর্চা এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা ও মফস্বলকেন্দ্রিক সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী রক্ষণশীল চেতনাসমৃদ্ধ নাট্যচর্চা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসময় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ এবং বিভিন্ন হলের উদ্যোগে প্রায়শই নাটক মঞ্চস্থ হতো। কিন্তু ঢাকা শহর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা চর্চায় অগ্রসরমান হলেও নাটকে নারীর অংশগ্রহণ তখনো সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। অধিকার আদায়ে সোচ্চার ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথে নাটক এক সহযাত্রী শিল্প মাধ্যমস্বরূপ আবির্ভূত হয় ক্রমাগত। এই আদর্শের অনুসারী নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শওকত ওসমান, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, আবুল ফজল, জসীমউদ্‌দীন, মুনীর চৌধুরী, ওবায়দুল হক সরকার এবং সৈয়দ আলী আহসান। কিন্তু তখনো কোনো নারী নাট্যকার আবির্ভূত হন নি।

নারীকে মঞ্চে অনুপস্থিত রেখে ‘পুরুষ দ্বারা নারী চরিত্র রূপায়ণ’-এর বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব শুরু হয়। ’৪৭ পরবর্তী সময়ে ঢাকায় এই বিপ্লবের অন্যতম পদক্ষেপ ছিলো মঞ্চে মেয়ে-শিশু শিল্পীর অভিনয়। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থার চোখ উপেক্ষা করে “১৯৪৭ সালের শেষ দিকে কি ’৪৮ সালের প্রথমভাগে পরপর দুইরাত্রি অভিনীত হয় ‘কামালপাশা’ ও ‘টিপু সুলতান’। বলা বাহুল্য, এতে পুরুষরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কেবল টিপু সুলতানের দুই শিশু পুত্রের ভূমিকায় ‘রোজি’ ও ‘রুবী’ নামে দুটি বাচ্চা মেয়েকে নামানো হয়।”[২৮] “সহ-অভিনয় তখন শঙ্কার কারণ ছিল। দেশ স্বাধীন হলেও দেশের মেয়েরা স্বাধীনতা লাভ করে নি।

১৯৪৮ সালে ‘কমলাপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন’-এর তত্ত্বাবধানে আবার মঞ্চায়িত হয়েছিল ‘টিপু সুলতান’। এই নাটকেও স্ত্রী চরিত্রগুলো পুরুষরাই অভিনয় করেছিলেন। কেবল কিশোরী সোফিয়া চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পাড়ারই কিশোরী মেয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তখন তিনি সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার চলচ্চিত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন।[২৯] আলোচনায় পাওয়া যায়, একটি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যাভিনয়ে কিশোরী মেয়েটিকে উপস্থাপনার কারণে ঢাকার রক্ষণশীল দর্শকসমাজ তা নিন্দার চোখে দেখেনি। “হঠাৎ করে মঞ্চে মহিলা দেখলে দর্শক মারমুখো হয়ে উঠতে পারে, তাই নাট্যগোষ্ঠী প্রথমে ছোট মেয়ে নামিয়ে দর্শককে

ধাতস্থ করে নেয়ার বুদ্ধি আঁটলেন।"[৩০] পাঠক মুজিবর রহমান খান-এর দেয়া আরেকটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৮ বা '৪৯ সালে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের একটি নাটকে আয়োজকরা পাণ্ডুলিপিতে অস্তিত্ব নেই এমন একটি শিশু চরিত্রের অবতারণা ঘটান, যে শিশুটি ছিলো নারী। সেসময় ঢাকার প্রায় প্রতিটি দলেরই লক্ষ্য ছিল, নারী পুরুষ উভয়ের যথার্থ অংশগ্রহণে নাটক মঞ্চায়ন। আর তাই প্রস্তুতিক্ষেত্র স্বরূপ এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি দর্শকদের নিন্দা ও আপত্তির বিপরীত-ধারা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ১৯৪৯ সালে 'নিউ থিয়েটার' মঞ্চে আব্দুল জব্বার খানের পরিচালনায় 'উদয়নালা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। "নাটকে মহিলা চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করেন কেবল একটি নারী চরিত্রে জলজ্যান্ত মহিলাকে মঞ্চে দেখা যায়। তিনি হলেন শিরীন চৌধুরী, বিবাহিতা এবং কয়েক সন্তানের জননী। নাটকের তিনটি স্ত্রী চরিত্রের জন্যই মহিলা শিল্পী খোঁজা হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন ঢাকার রক্ষণশীল সমাজের অভিভাবকরা কিছুতেই রাজি হন নি নিজেদের ঘরের মেয়েদের স্টেজে নামানোর ব্যাপারে। শিরীন চৌধুরী (এবং তার স্বামীরও) যথেষ্ট সৎ সাহস ছিল বলতে হয়। সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ঢাকার বাঙলা নাটকে মহিলার অভিনয় করার ব্যাপারে শিরীন চৌধুরীকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।"[৩১] এই দুঃসাহসের জন্য তাঁকে, তাঁর স্বামীকে এবং পরিবারকে দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।[৩২] "চাঁদপুরের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মহিলা হয়েও শিরীন চৌধুরী স্বামীর আগ্রহে নাটকে অভিনয় করার জন্য এগিয়ে আসায় আমাদের নাট্য আন্দোলনের গতি নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁকে অনুসরণ করে অভিনয়ের জন্য এগিয়ে এলেন আরো কয়েকজন প্রগতিবাদী মুসলিম মহিলা।"[৩৩] এঁদের মধ্যে মীনা (চৌধুরী) বাহাউদ্দিন, হোসনে আরা, মুমিনুন্নেসা, আয়েশা আক্তার, লায়লা সামাদ, ফেরদৌসী রহমান, রোকেয়া রহমান কবীর, নূরজাহান মুর্শেদ, মরিয়ম বেগম, বিলকিস বারী, হালিমা হক, রাজিয়া খান আমিন প্রমূখ। 'উদয়নালা' সম্পর্কে সিতারা সাত্তার (আয়েশা আক্তার) এক প্রবন্ধে বলেন,

> পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যজগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো, গত দু'বছর থেকে অভিনেতা ও অভিনেত্রী মিলে একত্রে অভিনয় করা। জনাব গোলাম রহমান সাহেবের 'উদয়নালা' নাটক থেকে আরম্ভ করে 'দুই পুরুষ', 'ছেঁড়া তার', 'মাটির ঘর', 'সাজাহান', 'নীলদর্পণ', 'সিরাজদ্দৌলা', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'নার্সিংহোম', 'অবরোধ' ও 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি নাটকে পুরুষ ও মেয়ে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। ... ঢাকার নাট্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেত্রে এটা যে খুবই আশাপ্রদ তা বলাই বাহুল্য।[৩৪]

১৯৫১ সালে 'মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট'-এ 'ডক্টরস ক্লাব' প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকের মাধ্যমে এদেশের নাট্য আন্দোলনের আরেকটি বিজয় সূচিত হয়। 'বিজয়া' নাটকে সবকটি নারী চরিত্রে অভিনয় করেন নারী কুশীলবগণ। 'উদয়নালা'

নাটকে অভিনেত্রীর আগমন ঘটলেও সবকটি নারী চরিত্রে মহিলারা অভিনয় করেননি। এদিক থেকে 'বিজয়া' প্রথম নারী-পুরুষ মিলিত সৌখিন নাট্যাভিনয়ের দাবীদার।[৩৫] ড. রফিকুল (রাফিকুল) ইসলাম তাঁর নিবন্ধ 'পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন মঞ্চ ও অভিনয়'-এ উল্লেখ করেছেন, ১৯৫২ সালে শরফুল আলম-এর উদ্যোগে পরিচালক-প্রযোজক ও নাট্য নির্দেশক হাবিবুল হকের নামানুসারে গড়ে ওঠা 'হাবিব প্রোডাকশান্স'-এর 'মেঘমুক্তি' নাটকের মধ্য দিয়ে ঢাকায় প্রথম সহ-অভিনয়ের প্রচলন হয়। এ নাটকের পরেই, সহ-অভিনয় অনুসরণ করে মেডিকেল কলেজের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' এবং সাংবাদিক ইউনিয়ন-এর 'নীলদর্পণ' নাটকটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩৬]

'বিজয়া' নাটক মঞ্চায়ন সম্পর্কে লায়লা সামাদ ১৯৭৩ সালে 'দৈনিক সংবাদ'-এ এক নিবন্ধে বলেন,

> ... এদেশের নাট্যাভিনয়ের যথার্থ ইতিহাস শুরু ১৯৫০ সাল থেকে। তখন ঢাকার 'মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট'-এ 'বিজয়া' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ ঢাকার মঞ্চে এটাই প্রথম নাটক, যে নাটকে উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা অপেশাদার বাঙালী মুসলমান নাট্যানুরাগীরা সহ-অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। তখনকার সামাজিক পরিবেশে এ ঘটনা এ দেশের নাটকের ইতিহাসে এক বিপ্লব বলা চলে। এই নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, রাজিয়া খান, নূরজাহান মুর্শেদ প্রমুখ নাট্যোৎসাহী।[৩৭]

শিক্ষিকা সিতারা সাত্তার 'নীলদর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক নন্দিত হন। মুসলমান মহিলার অংশগ্রহণ সম্ভব হতো না।...[৩৮]

১৯৫১ সালে 'মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে' আব্দুল জব্বার খান রচিত 'ঈশা খান' নাটকে অভিনয় করেন শিরীন চৌধুরী, বিলকিস বারী, গীতা দত্ত, জাহানারা জামান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গীতা দত্ত তাঁর অভিনয় জীবনের বড়ো সাফল্য অর্জন করেন 'শততম অভিনয় রজনী উদযাপন' করে। পঞ্চাশের দশকে যখন নাটকাভিনয়ে অভিনেত্রী ছিলো দূর্লভ তখন থেকেই তাঁর নিরলস নাট্যচর্চা। এ উপলক্ষ্যে ১৩৬৩ সনের ৮ই আষাঢ় শুক্রবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা লিখেছিলো :

> ঢাকায় মহিলা অভিনয় শিল্পীদের সংখ্যা খুবই কম, তার উপর শক্তিশালী শিল্পীর সংখ্যা আরো নগণ্য। এদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শিল্পী সম্প্রতি তার অভিনয় জীবনের একশততিতম রাত্রি উদযাপন করেছেন। ... এই শিল্পী হলেন গীতা দত্ত।[৩৯]

১৯৫১ সালে 'রূপশ্রী নাট্যদল' প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'দুই পুরুষ' নাটকটি 'রূপমহল সিনেমা হল'-এ মঞ্চস্থ হয়। হাবিবুল হকের পরিচালনায় নাটকটিতে মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পীরাই অভিনয় করেন। এরা হলেন শিরীন

চৌধুরী, সেতারা রহমান, সুরাইয়া (ডলি) চোধুরী, টুলি রায় পালধী।[৪০]

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রজনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ মিছিলে পুলিশের হামলা, নির্যাতন, রক্তপাত ও জীবননাশ বাঙালি মানসে এক নতুন জীবন বোধের উদ্দীপনা যোগায়। 'ভাষা আন্দোলন' রক্ষণশীল মৌলবাদী ও গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। রঙ্গমঞ্চে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকটি উল্লেখযোগ্য।[৪১] বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চায় মেয়েরাও যুক্ত হয়। "পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েরাই মেয়ে রূপে দেখা দিতে আরম্ভ করেন নাট্যমঞ্চে।"[৪২] প্রসঙ্গত আলোচনায় জানা যায়, যে মহিলা শিল্পীদের নাটকে অভিনয়ের জন্য পাওয়া যেতো তাদের অভিনয় প্রতিভা ও দক্ষতা ছিল সমস্যাক্রান্ত। সহজেই অনুমান করা যায় এর কারণ। অনিয়মিত অনুশীলনের পর্যায়ে ছিল এসব শিল্পীদের নাট্যাভিনয়। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকগুলোতে সেদিন অনেক বলে কয়ে আমাদেরই ঘরের মেয়ে ফরিদা বারি মালিক, মাসুমা খাতুন, কামরুন্নাহার লায়লী, সৈয়দা রওশন আরা, জাহানার লাইজু এবং আরো কাউকে পাওয়া যেত বটে, কিন্তু সেটা অনিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানের জন্য এবং তা-ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকের জন্য। বর্তমানের মত নিয়মিত ব্রতশীল নাট্যচর্চার জন্য নয়।"[৪৩] বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাটকগুলোর বেশিরভাগই ছিল সামাজিক বিষয়ভিত্তিক এবং সেসব ছিল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখ লিখিত উপন্যাসের নাট্যরূপ অথবা এঁদের রচিত নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মঞ্চায়িত নাটকগুলো ছিল সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় বিষয়ভিত্তিক।[৪৪] নক্সাধর্মী কৌতুক নাটক এবং জীবনস্পর্শী নৃত্যনাট্য মঞ্চায়নও এসময়ে সীমিতভাবে লক্ষযোগ্য।[৪৫] ১৯৫১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে 'সংস্কৃতি সংসদ'-এর উদ্যোগে হাবিবুল হকের পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নাটকটি মঞ্চায়ন সম্পর্কে ওবায়দুল হক সরকার-এর স্মৃতিচারণ উল্লেখযোগ্য :

> ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ নাম দিয়ে একটা দল গঠন করি। উদ্দেশ্য নাটক মঞ্চায়ন করা। বহু নাটক যাচাইয়ের পর 'জবানবন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নাটক ঠিক হলো কিন্তু রিহার্সালের জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা পাওয়া যায় না। ঠিক হলো, প্রগতিশীল চিন্তাধারা বজায় রাখতে হলে নাটকের নারী চরিত্রে ছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করাতে হবে।
>
> ছাত্রদের নাটকে ছাত্রীরা অভিনয় করবে। বহু চেষ্টা তদবিরের পর মিস নূরুন্নেহার নামের একজন ছাত্রী রাজী হন। কিন্তু বাকী দুটি

> চরিত্রের জন্য আর কোন ছাত্রী সাহস করে এগিয়ে আসেননি। এই পর্যায়ে শিক্ষকতার সাথে জড়িত মিসেস রোকেয়া কবীর ও মিসেস লায়লা সামাদকে পাওয়া গেলো। নূরুন্নেহার থাকেন চামেলী হাউসে (বর্তমানে রোকেয়া হল)। তার যাতায়াতে ভীষণ কড়াকড়ি। তখন মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী তার 'স্থানীয় অভিভাবক' হয়ে নূরুন্নেহারকে নীলক্ষেতে তাদের কোয়ার্টারে নিয়ে এলেন। এখানেই নাটকের রিহার্সাল শুরু হলো।
>
> তখনকার দিনে ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা কথা বলতে পারতো না। কথা বললেই তাদের বিরুদ্ধে প্রক্টরের নোটিশ জারি হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রী একত্রে অভিনয় করবে তা ভাবাই যায় না। সুতরাং মহা হৈচৈ পড়ে গেলো। তখন নাটক সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এতে নাট্যগোষ্ঠী বিচলিত না হয়ে বরং যথাসময়ে নাটক মঞ্চায়ন করে পত্র-পত্রিকা ও দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের মিলিত নাট্যাভিনয়কে নৈতিকতা বিরোধী বলে নিন্দা জ্ঞাপনের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে সহ-অভিনয়ের দাবী উত্থাপিত হয়।[৪৬]

পূর্ববাংলায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক সংকট বিদ্যমান ছিল—তা সামরিক বাহিনীর পক্ষে ক্ষমতা দখলের পথকে সুপ্রশস্ত করে। ভয়-ভীতি, দমন, অত্যাচার, গ্রেফতার অব্যাহত রেখে সামরিক জান্তা সমগ্র দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বিপরীত দিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও চলতে থাকে নানা মাধ্যমে। নাটক তার একটি। এ সম্পর্কে ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার তথ্যানুসন্ধান করে সুকুমার বিশ্বাস তাঁর 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা' গবেষণা গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সেসময় ঢাকা শহরে নাট্যচর্চায় শুধু নারীর অংশগ্রহণ ও উদ্যোগে 'ইডেন কলেজ ছাত্রী ইউনিয়ন', 'মেডিকেল কলেজ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাত্রী হল ইউনিয়ন', 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়'-এর ছাত্রীবৃন্দ, 'বিদ্যার্থিনী ভবন ছাত্রীবৃন্দ', 'মহিলা নাট্য সংগঠন', 'ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ' অনিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চায়ন করে।[৪৭] এসব নাটকের নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রেই অভিনয় করেন নারী শিল্পীবৃন্দ। পাশাপাশি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ', 'ঢাকা ছাত্র ইউনিয়ন', 'ড্রামা সার্কেল' সহ আরো অনেক সংগঠনও নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণে নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখে। এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে 'ড্রামা সার্কেল'। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একদল তরুণ নিয়ে দলটি স্থানীয় নাট্যকলায় আধুনিক পাশ্চাত্য কলাকৌশল প্রবর্তনে অবদান রাখে। এসময় উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের তালিকায় যুক্ত হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সাঈদ আহমদ, আলাউদ্দিন-আল-আজাদ, আজিমুদ্দিন আহমদ, আনিস চৌধুরী, বজলুর রশীদ,

সিকান্দার আবু জাফর, রাজিয়া খান এবং লায়লা সামাদ প্রমুখ।[৪৮] উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালের ১৩ থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত বাংলা একাডেমী আয়োজিত 'নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশিল্প' শীর্ষক ছয়দিনব্যাপী সেমিনারে বহু গুণীজন অংশ নেন। নারীআলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সাবেরা মুস্তফা, রহিমা খাতুন, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, লায়লা সামাদ, রাজিয়া খান ও জহরত আরা।[৪৯] একই সালের ১১ ও ১২ই জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী' পরিবেশন করে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নির্দেশনায় নাটকটিতে অভিনয় করেন ইকবাল বাহার চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, লিলি চৌধুরী, রেজা চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মামুন, বদরুদ্দিন আহমদ, রামেন্দু মজুমদার, আমিনুদ্দিন, রাজিউল হাসান, বদিউজ্জামান, এনামুল হক, মাহবুবা আক্তার, রোজি মজিদ ও অধ্যাপিকা রাজিয়া খান। *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, সাম্প্রতিককালে ঢাকায় মঞ্চস্থ সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'।[৫০] ফেরদৌসী মজুমদার উক্ত নাট্যগোষ্ঠীর একজন অন্যতম কর্মী ছিলেন, যিনি বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রীরূপে পরিগণিত হন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকার নাট্যচর্চায় নারীর ভূমিকা

"১৯৭১-এর স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তির যে বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবন দেখা দিয়েছিল, তার সবচাইতে বেগবান ক্ষেত্রটি হয়তো নাটক। অগণিত নাট্যদল অবিস্মরণীয় এক স্বতস্ফূর্ত তাগিদে এগিয়ে এলো নাটক নিয়ে। ঢাকায় এসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে 'থিয়েটার', 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়', 'নাট্যচক্র', 'আরণ্যক নাট্যদল', ও 'ঢাকা থিয়েটার'।[৫১]... কলকাতাকেন্দ্রিক 'গ্রুপ থিয়েটার'-এর প্রভাবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নাট্যদল গড়ে ওঠে। এই ধারাটির সফল বাস্তবায়ন ঘটে ১৯৭৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, যখন 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার স্লোগান নিয়ে বাদল সরকার-এর 'বাকী ইতিহাস' নাটকটি ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে মঞ্চায়ন করে। এ থেকেই '৭০-এর দশকে দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার রেওয়াজ গড়ে ওঠে।[৫২] যদিও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের 'গ্রুপ থিয়েটার' নাট্যচর্চা মূল স্রোতধারা হিসেবে পরিগণিত হয়, তবুও অফিস ও পাড়ার সৌখিন নাট্যচর্চা এখনও বিদ্যমান, যদিও এ ধারাটি গৌণ। '৭০-এর দশকের গোড়াতে নাট্যদলগুলোতে অভিনেত্রী সংকট ছিল প্রকট। কিছু মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল তরুণীদের উৎসাহে ধীরে ধীরে এ দশকের শেষ নাগাদ 'গ্রুপ থিয়েটার' নাট্যদলগুলো এ সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।[৫৩] 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলনের সাথে যুক্ত দলগুলো আদর্শিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং মৌলবাদী ধর্মরাজনীতির বিরোধী শক্তি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

"গ্রুপ থিয়েটারের যে চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর,

তার কোনো প্রকাশ পাকিস্তানী আমলের নাট্যচর্চায় আমরা প্রত্যক্ষ করি না। একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিল ড্রামা সার্কেল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সব বাধা ও দ্বিধার অর্গল খুলে দিলো। সবকিছু নতুন করে, নতুন উদ্যমে শুরু করার প্রেরণা থেকেই এদশে নবনাট্যচর্চার শুরু। স্বাধীনতা যে একটি জাতির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে কতোটা সুফলা করতে পারে, তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বাংলাদেশের নাটক।"[৫৪] স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের নগরায়তনিক নাট্যচর্চায় যে ধারাসমূহ লক্ষ্য করা যায় সে ধারাসমূহে নারীর ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ আজ শুধু অভিনয়ে সীমাবদ্ধ নয়। নাটক রচনা, পরিচালনা, পরিকল্পনা, সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন, দেশে-বিদেশে নাটক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও নাট্যসংগঠনভূক্ত নাটক বিষয়ক পাঠ ও প্রয়োগে শিক্ষকতা ও অধ্যয়ন, স্থানীয়-জাতীয়-আন্তর্জাতিকপর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা ও অংশগ্রহণ, উচ্চতর গবেষণা, বিদেশী নাটক অনুবাদ-ভাবান্তর, নাটক বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ বিদ্যমান।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান অন্তর্ভুক্ত ঢাকার নিয়মিত নাট্যদলের সংখ্যা ৭২ এবং সহযোগী সংগঠন ৮টি। প্রতিটি দলের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০-৬০। এরমধ্যে দলে নিয়মিত নারী সদস্য মোট সদস্যের শতকরা ২-১০ ভাগ। এর মধ্যে পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলোতে এবং নবীন ও সৃজনমুখর দলে নারীর অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক। অপরদিকে, অফিস, ক্লাব, সমিতি, পাড়া ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানভিত্তিক অনিয়মিত শৌখিন নাট্যদলের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে এই দলগুলো ঢাকার বিভিন্ন মিলনায়তন ও নাট্যমঞ্চে অনিয়মিতভাবে যে নাটক পরিবেশন করে তাতে অভিনেত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৫৫]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নির্দিষ্ট মিলনায়তনের বাইরে নগর ও লোক আয়তনের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতিকে জীবন-ঘনিষ্ঠরূপে প্রকাশের ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ দুটি হলো: ঢাকা থিয়েটার প্রবর্তিত 'গ্রাম থিয়েটার' ও আরণ্যক সঞ্চালিত 'মুক্তনাটক'। এই উভয় নাট্য প্রক্রিয়া মূলত ঢাকার বাইরেই পরিচালিত হতো এবং পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি নারীরাও ঢাকা থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে অংশ নিতেন। নব্বুইর দশকে যখন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে তখন ঢাকার রাজপথের বিভিন্ন মোড়ে পথনাটকে অংশ নিয়েছেন গণতন্ত্রকামী নাট্যদলের নারী কর্মীরাও।

বিশ শতকের আশির দশক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় নাটক বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পাঠ ও প্রয়োগ সম্বলিত স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর অধ্যয়নের সূচনা দেশের নাট্যসংস্কৃতির ধারায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। যদিও ঢাকায় স্বল্পকালীন পদ্ধতিগত নাট্য প্রশিক্ষণের শুরু 'নাট্যচক্র'-এর উদ্যোগেই হয়েছিলো। পরে শিল্পকলা একাডেমী ও একাধিক নাট্যদল

স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে। সম্প্রতি ঢাকার একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষঙ্গ বিষয় হিসেবে নাট্যকলা পড়ানো হয়। উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে যুক্ত হওয়ায় নাট্যকলা সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগণ্য। কিন্তু পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে অর্জিত নাট্যজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বিধায় পাস করার পর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যায় এবং অধিকাংশই ভিন্ন পেশায় যুক্ত হন। তবে অধ্যয়নকালীন তত্ত্বীয় পাঠের পাশাপাশি নাট্যাভিনয়, নির্দেশনা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অনুশীলনে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য অনুপস্থিত থাকায় নারী শিক্ষার্থীর সফলতার হার উৎসাহব্যঞ্জক। এসবের ভীড়েও যে নারী শিল্পীগণ দারুণ উদ্যম আর গতিশীল উৎসাহ নিয়ে ঢাকার মঞ্চ ও পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তাদের অক্লান্ত শ্রম আর মেধার প্রতি সম্মান প্রদর্শন গর্ব ও আনন্দের।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ঢাকার বেইলি রোড (বর্তমানে নাটক সরণী)-এ অবস্থিত 'মহিলা সমিতি' মঞ্চের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি দেশের নবনাট্য চর্চাকে লালন করেছে, হয়ে উঠেছে নাটকের প্রাণকেন্দ্র। মহিলা সমিতি পূর্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সভা সমিতির প্রয়োজনে ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করতো। কিন্তু সেসময় নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের জন্য এই সমিতির মঞ্চের কোন বিকল্প ছিল না। যদিও পরবর্তীতে একই রোডে 'গার্লস্ গাইড হাউজ' মঞ্চ ঢাকার নিয়মিত নাট্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অনিশ্চয়তার বিপরীতে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্যে মহিলা সমিতির সভানেত্রী নাট্য-প্রাণ প্রয়াত নীলিমা ইব্রাহিম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর আগ্রহেই মহিলা সমিতি মঞ্চ শুধু নাট্যদলকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়। সম্ভবত নাটক বিষয়ে তিনিই প্রথম নারী গবেষক যিনি পিএইচডি করেন 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক' বিষয়ে। তিনি নাট্যদল 'রঙ্গম'-এর সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন সহ নাটক রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন।[৫৬]

ঢাকায় এখন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ ও কারিগরিভাবে উন্নত মঞ্চ নির্মিত হয়েছে, নিয়মিত দর্শক তৈরি হয়েছে, নাগরিক সুবিধা বেড়েছে এবং নাট্যচর্চার সামাজিক স্বীকৃতিও এসেছে (সব শ্রেণিতে নয়) কিন্তু পেশাদারিত্বের চর্চা না থাকায় সমস্ত আবেগ, ভালোবাসা ও ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও শখের পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি নাটক। ফলে নাট্যচর্চার অধিকাংশক্ষেত্রেই দক্ষতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জীবিকার তাগিদে প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকর্মীকেও তার চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। প্রয়াত শক্তিসম্পন্ন অভিনেত্রী নাজমা আনোয়ারকে নিয়ে ড. বিপ্লব বালা'র উক্তি উদ্ধৃত করে চলমান আলোচনা শেষ করছি—

> নাজমা আনোয়ারকে দেখলে বিস্ময় জাগতো। এ কোন নারী নাগরিক

ঘেরাটোপে! যেন কতকালের যৌথ অবচেতন ফুঁড়ে প্রত্ন মাতৃমূর্তিকা আবির্ভূতা— বড়ই বেমানান দেশ-কালে। সুলতানের ছবির নারী বুঝি বাস্তব আদলে দণ্ডায়মান! এমনই লাগতো। গ্রামদেশে কখনো সখনো দেখা যোগিনী খনার সহোদরা যেনবা। চিরকালের বীর্যাবতী বঙ্গবালা।

....

ঢাকার মঞ্চে আছেন ফেরদৌসী মজুমদার, শিমূল ইউসুফ, সারা যাকের। তাদের উত্তর প্রজন্মের দেখা মিলে কই ঢাকার মঞ্চে? ... ঢাকায় অবশ্য রোকেয়া রফিক বেবী আছেন, লাকী ইনাম, রওশন আরাও বর্তমান। ছিলেন নায়লা নুপূর, সুবর্ণা মুস্তফা। পদাতিক-এর 'মা' নাটকের কাজল কতোখানি যে মা হয়ে উঠেছিলেন—আজও তা মনে পড়ে। 'দর্পণে শরৎশশী'তে মিমি [আফসানা মিমি]; বা নাগরিকের [নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়] নিমা [নিমা রহমান] কতই যে সম্ভাবনা ছিল। প্রাচীর [রোকেয়া প্রাচী]ও ছিলো নাকি? আজও তবু নিশাত [ইশরাত নিশাত], ত্রপা [ত্রপা মজুমদার] আছেন। ঢাকা পদাতিকের তিশা 'বিষাদসিন্ধু'তে কিংবা নাগরিকের প্রাক্তণী নূনা আফরোজ 'স্বপ্নবাজ' নাটকে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিলেন। অল্পদিনের দল কালিক-এর 'মাধবী' নাটকে নামচরিত্রের অভিনেত্রী রুনা আফরোজ বা নবধারা দলের 'যযাতি' বা অন্য একটি নাটকের দু'একজন এমনই উজ্জ্বল আবির্ভূতা হয়েছিলেন। 'ডলস্ হাউজ' [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ প্রযোজিত] নাটকের ছন্দাও তো তেমনি একজন ছিলেন। যেমন 'পুতুল খেলা' নাটকে কাকলী। তারা সব আজ কে কোথায়?—কৈ কৈ? কোথা গেল হাঁসগুলো তই তই তই! বাজার কিংবা সংসারকর্মে বিসর্জিতা বুঝিবা![৫৭]

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। Syed Jamil Ahmed, 'Female performers in the Indigenous Theatre of Bangladesh', Ferdous Azim and Niaz Zaman (edited) *Infinite Variety-Women in Society and Literature*, Dhaka 1994, p. 263.

২। Eugenio Barba and Nicola Savarese, *A Dictionary of Theatre Anthropology*, (London: Routledge, 1991) p. 79-81 cited by Syed Jamil Ahmed, *ibid*, p. 264.

৩। Rustom Bharucha, *Theatre and the World*, (New Delhi: 1990), p. 73,cited Syed Jamil Ahmed, *ibid*, p.264.

৪। বিস্তারিত দেখুন, সৈয়দ জামিল আহমেদ, 'নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস', *সাহিত্য পত্রিকা*, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ.১২৯-১৪৭।

৫। সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৮।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ.২।

৭। সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৮। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির' প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন'-এ দেখুন মুনতাসীর মামুন *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের থিয়েটার ও নাটক*।

৯। শিশির কুমার বসাক, 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১০.১০.১৯৬৪, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, পৃ. ৪।

১০। বিপ্লব বালা, নাগরিক নাট্যচর্চা, ড. ইস্রাফিল শাহীন সম্পাদিত পরিবেশনা শিল্পকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৭, পৃ. ২৮৪।

১১। সত্যেন সেন, 'ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন', *শহরের ইতিকথা*, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২১।

১২। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন', *সাহিত্য পত্রিকা*, নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ. ৪১।

১৩। শিশির কুমার বসাক, ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস, *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১৭.১০.১৯৬৪, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, পৃ. ৮।

১৪। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, ঢাকায় নাট্য আন্দোলন, পৃ. ৩৯-এ বলেন, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রাউন থিয়েটারে 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনীত হয়।

১৫। ঐ, পৃ. ৪০।

১৬। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৯৩, উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, ঢাকায় নাট্য আন্দোলন, পৃ. ৪৫।

১৭। সত্যেন সেন, শহরের ইতিকথা, পৃ. ১০।

১৮। সত্যেন সেন, শহরের ইতিকথা গ্রন্থের ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন প্রবন্ধ (পৃ. ৮)-এ বলেছেন, জুবিলি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্য শাসনকালের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্রাউন থিয়েটার সৃষ্টি হয়।

১৯। শিশির কুমার বসাক, উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, পূর্ববঙ্গের থিয়েটার, পৃ. ৫০।

২০। *ঢাকা প্রকাশ* ১৭.৮.১৮৮৯।

২১। সুকুমার বিশ্বাস, উদ্ধৃত সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব, পৃ. ৬৩।

২২। *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৪৭, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের

নাট্যচর্চা, পৃ. ১০।

২৩। সত্যেন সেন, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ. ১১।

২৪। দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৪৭, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ. ১০।

২৫। সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা*, পৃ. ২৮।

২৬। শিশির কুমার বসাক, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ. ১৯।

২৭। সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ. ২০।

২৮। জাহানারা ইমাম, 'নাটকে মহিলা শিল্পী', *ঢাকা মহানগরীর নাট্যচর্চা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.৬৪।

২৯। ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪।

৩০। ওবায়দুল হক সরকার, 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্লাবে ও অফিসে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চায়িত 'নাটক: পর্যালোচনা', ঢাকা মহানগরীর নাট্যচর্চা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ৯৯।

৩১। জাহানারা ইমাম, নাটকে মহিলা শিল্পী, পৃ.৬৫।

৩২। ওবায়দুল হক সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পৃ. ১০০।

৩৩। ওবায়দুল হক সরকার, *পঞ্চাশ দশকের পত্র-পত্রিকায় ঢাকার নাটক*, পৃ. ১৯।

৩৪। সিতারা সাত্তার, 'পূর্ব পাকিস্তানের নাটক ও নাট্যশালা', *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা ৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, উদ্ধৃত ওবায়দুল হক সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পৃ. ১৯।

৩৫। ওবায়দুল হক সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পৃ. ২২।

৩৬। রাফিকুল ইসলাম, 'পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন মঞ্চ ও অভিনয়', বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৩৭। লায়লা সামাদ, আমাদের নাটক, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ. ৭৬।

৩৮। *দৈনিক আজাদ*, উদ্ধৃত ওবায়দুল হক সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৯১।

৩৯। জাহানারা ইমাম, *নাটকে মহিলা শিল্পী*, পৃ. ৬৫।

৪০। সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব, পৃ. ৬৮।

৪১। আসকার ইবনে শাইখ, 'বর্তমান নাট্যচর্চা', 'ঢাকা মহানগরীর নাট্যচর্চা', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২,, পৃ. ৮।

৪২। ঐ, পৃ. ১৬।

৪৩। সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাট্যাভিনয়ে, পৃ. ৬৮।

৪৪। সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পৃ. ১২৬।

৪৫। ওবায়দুল হক সরকার, বিভিন্ন, পৃ. ২৯।

৪৬। বিস্তারিত দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের, পৃ. ২১৬-২২৯।

৪৭। সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাট্যাভিনয়ে, পৃ. ৭৩।

৪৮। সুকুমার বিশ্বাস, পৃ. ২৫০।

৪৯। 'দৈনিক ইত্তেফাক', উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের, পৃ. ৩২২

৫০। 'থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে, প্রথম অভিনয় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়' নভেম্বর ১৯৬৮, প্রথম অভিনয় আগস্ট ১৯৭২, 'নাট্যচক্র' প্রতিষ্ঠিত হয় ১০ আগস্ট ১৯৭২, 'আরণ্যক নাট্যদল' ১৯৭২, ও 'ঢাকা থিয়েটার' জুলাই ১৯৭৩ উদ্ধৃত সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাট্যাভিনয়ে, পৃ. ৭৬।

৫১। ঐ, পৃ. ৭৬।

৫২। ঐ, পৃ. ৭৬।

৫৩। রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ৭।

৫৪। সাক্ষাৎকারঃ ঝুনা চৌধুরী, সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান।

৫৫। রামেন্দু মজুমদার, 'নাট্যপ্রেমী নীলিমা ইব্রাহিম', লেখক সম্পাদিত 'থিয়েটার' নাট্য ত্রৈমাসিক, সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার, অক্টোবর ২০০২, ঢাকা, পৃ. ১৯৩।

৫৬। বিপ্লব বালা, 'বঙ্গবালা নাজমা আনোয়ার', হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত *থিয়েটারওয়ালা*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ১১।